গণঅধিকার পরিষদ - জিওপি

Gono Odhikar Parishad – GOP

আত্মপ্রকাশের ঘোষণা

৫০ বছর হলো বাংলাদেশের বয়স। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা আজ প্রিয় দেশবাসীর সামনে হাজির হয়েছি। মহান সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করে, আমূল বদলে দেয়ার বার্তা নিয়ে, নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়সহকারে।

আমাদের জন্ম গত শতাব্দীর নয়ের দশকে। বাংলাদেশের স্বপ্নহীন লাখ লাখ পরিবারের তরুণ সদস্য আমরা। যারা কোনো মানসম্পন্ন শিক্ষা পাইনি; উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখানে মাথাগোঁজার ঠাঁইটুকুও জোটেনি; আমরা যে পথ, রাস্তা, মহাসড়ক ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতাম তাও নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ছিল না। শিক্ষা শেষে চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, যা আজও নেই; চাকরির স্বপ্নটুকু আটকে ছিল কোটার বেড়াজালে।

চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কার করে মেধার অগ্রাধিকার; আর যোগাযোগ, যাতায়াত ও চলাচলের জন্য নিরাপদ সড়ক ও পরিবহনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা এদেশের শাসক, নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিকদের নজরে আসেনি কখনো। প্রাত্যহিক জীবনের এমন অজস্র সমস্যা ও সংকটে ডুবে আছে প্রিয় মাতৃভূমি। দেশবাসীর এমন মৌলিক, জরুরি ও মানবিক প্রয়োজনকে কোনো গুরুত্ব দেয় না রাজনীতিক ও আমলারা।

কুৎসা, হামলা, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, কারাবরণ ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক বৈরি বাস্তবতায় আমরা কোটা সংস্কার আন্দোলন করেছি। তাতে দেশজুড়ে পেয়েছি শিক্ষার্থীদের অভাবনীয় সমর্থন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ২০১৮-তে এটা প্রথম একটি যুগান্তকারী আন্দোলন, যা সরকারকে বাধ্য করেছে তাদের বৈষম্য সৃষ্টিকারী, অন্যায্য ও অগ্রহণযোগ্য কোটা সংরক্ষণ নীতি বাতিল করতে। এই আন্দোলন ও এর বিজয়ের মধ্যদিয়ে 'ছাত্র অধিকার পরিষদ' দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠনে পরিণত হয়। একই সাথে দেশের সকল শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সরকার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা আয়োজন করতে বাধ্য হয়। সেখানে ব্যাপক নির্যাতন, ভোটে অনিয়ম ও কারচুপি করেও 'ছাত্র অধিকার পরিষদ'-এর বিজয় রোখা যায়নি। এই সাফল্য নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আস্থার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

তরুণদের এই মহাজাগরণের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী শুরু হয় নিরাপদ সড়কের দাবিতে যুগান্তকারী আরেক আন্দোলন। পরিবহন সন্ত্রাসে ঢাকার একটি স্কুলের দুইজন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা এই সংগ্রাম মাত্র তিন দিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দেশের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাজসচেতন, জনহিতকর ও সুশৃঙ্খল এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেয় অতি সাধারণ শিশু-কিশোররা। দীর্ঘ দশ দিন স্থায়ী এই লড়াই অমীমাংসিতভাবে চাপা পড়ে ক্ষমতাসীন দলের হেলমেট-সন্ত্রাসী, পুলিশ ও বিজিবি'র বর্বর ও রক্তক্ষয়ী হামলা, অজস্র গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলার ভারে।

২০১৮ সালে গড়ে ওঠা ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া 'কোটা সংস্কার' এবং 'নিরাপদ সড়ক' আন্দোলন প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও নতুন সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হতে প্রস্তুত রয়েছে।

আমরা সেই ভরসায় বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তুলে ব্যাপক প্রতিরোধ ও প্রাণপণ লড়াই করার শপথ নিয়ে আজ মাঠে নামছি। স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত এই দেশে আমরা মজলুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি পালন করছি শোষিত, সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের পক্ষ নিয়ে। পেছনে ফেলে আসা অর্ধশতাব্দী স্মরণ করছি- গরিব মানুষের বঞ্চনা, অমর্যাদা ও অস্বীকৃতির স্মৃতির ওপর ভর করে।

দেশবাসী দেখছে, একই দেশে বিভক্ত হয়ে পড়া দুইদল মানুষ একাত্তরে পাওয়া স্বাধীনতাকে স্মরণ করছে ভিন্ন ভিন্নভাবে। দুই পক্ষের মূল্যায়ন একেবারেই বিপরীত অবস্থান ও ভিন্ন অভিজ্ঞতাজাত। শাসকদের জন্য মহাসাফল্যের ৫০ বছর; তাদের সম্পদ, বিত্তবৈভব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। আর মজলুমদের জন্য শোষণ, ভাওতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারহীন অর্ধ শতাব্দী। তারাও ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী! তবে সবচেয়ে কম মজুরির কঠোর কায়িক শ্রমের দিনমজুর হয়ে। প্রবাসী শ্রমিকরা রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে কোটি কোটি ডলার নিয়ে আসে দেশের জন্য। আর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাশালীরা লুটপাট করে তা পাচার করে নিয়ে জমায় উন্নত বিশ্বে।

গণহত্যা, নারী নির্যাতন, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞসহ অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ, কোটি মানুষের রক্ত ঘাম ও শ্রম, লাখ লাখ পরিবারের ঘর-

বাড়ি, ভিটা-মাটি ছেড়ে পলায়ন, বাস্তুচ্যুতি ও শরণার্থী হওয়ার কষ্টকর পথ বেয়ে এসেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ৫০ বছরেও সেদেশে গণতন্ত্র আসেনি, ভোটাধিকার হারিয়ে গেছে, মৌলিক ও মানবিক অধিকার নেই, সুশাসন ও সুবিচার সুদূর পরাহত; অর্থনৈতিক মুক্তিও ঘটেনি। কখনো সামরিক স্বৈরাচার, কখনো গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী দুই পক্ষের হানাহানির মধ্যেও কয়েক বছর দেশে একটি দুর্বল ও ভঙ্গুর নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু ছিল, তাও এখন নেই। বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে সকল রাজনৈতিক দল, জনসমাজ ও রাষ্ট্রের সব কয়টি প্রতিষ্ঠানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একবারই শুধু একটি মাত্র সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। তা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা; যারা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করে বিজয়ীদের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব তুলে দিতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে সংবিধান থেকে এই বিধান বাতিল করে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে প্রধান বিরোধী দলসমূহের অংশগ্রহণ ছাড়া ও ভোটারবিহীন নিশিরাতের দুই-দুইটি নির্বাচনের মাধ্যমে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পতিত হয়েছে গভীর সংকটে। অকার্যকর হয়ে গেছে দেশের সংবিধান।

এতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এক দীর্ঘস্থায়ী বিপদে পড়েছে। জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনীর মতো

প্রতিষ্ঠানের দলনিরপেক্ষ বলে যে অবস্থান নেয়ার কথা ছিল, তা আজ আর নেই! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির শাসনব্যবস্থাকে এতটাই অধঃপতিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে শুধু অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না; নতুন প্রজন্মকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সব কয়টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে যা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ধর্ম, জাতিসত্তা ও নানান সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মতামতের বৈচিত্র্য রয়েছে বাংলাদেশে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নানান হুমকি, হামলা ও হাঙ্গামা থেকে একে সুরক্ষা দেয়া। দেশে দীর্ঘদিন যাবত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার না থাকায় এমন বিপদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এতে বিশ্বদরবারে কলঙ্কিত ও হেয় হচ্ছে বাংলাদেশের মুখ। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে পরধর্ম, পরমত ও পররুচির প্রতি অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছে। এমন সকল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাৎক্ষণিক ও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব করছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলা তদন্ত করতে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিচ্ছে। বিচারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অযত্ন, অবহেলা ও গাফিলতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমরা আজ যখন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিচ্ছি, তখন আমাদের মাতৃসম পৃথিবী দুইটি বড় সংকট মোকাবিলা করছে। ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় মানবজাতির জন্য অপূরণীয়, অপরিবর্তনীয় ও ধ্বংসাত্মক ক্ষতি বয়ে আনছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মহাবিপদে পড়া অন্যতম দেশ হলেও এই ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতি নেই

বাংলাদেশের। এর নানাবিধ ক্ষতি রোধের জন্য পরিবেশবান্ধব পথ অনুসরণের ক্ষেত্রেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই আমাদের।

দ্বিতীয় বিপদ তৈরি করেছে করোনা মহামারী। এটা ব্যাপক জীবনসংহারী এবং এর আর্থসামাজিক প্রভাবে দারিদ্রতা বাড়ছে পৃথিবীজুড়ে। এই মহামারী বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অকার্যকারিতা, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা এবং দুর্নীতির ভয়াবহতা উন্মোচিত হয়েছে। সংক্রমিত মানুষ অসুস্থ অবস্থায় টেস্ট করাতে পারেনি, ডাক্তার খুঁজে পায়নি, ভাগ্যে জুটেনি প্রয়োজনীয় ওষুধ।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ মৌলিক সকল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এমন অসহায় অবস্থাতেই পড়ে আছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পর এভাবে চলতে পারে না আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। দেশবাসীর এমন সকল অপ্রাপ্তির বেদনা বদলে দেয়ার জন্যেই আমরা হাল ধরতে চাই এই রাষ্ট্রের। একে সবল ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে; দাঁড় করাতে হবে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, সুশাসন, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী জাতি হিসেবে।

সেই লক্ষাভিমুখী সংগঠন, আন্দোলন ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজে আমরা দেশবাসীর সমর্থন চাই, সাহায্য চাই; চাই, তারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমূল বদলে দেয়ার এই নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় আমাদেরকে সমর্থন যোগানোর জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি। আজ সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, আমরা নানান ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া বহুস্তরবিশিষ্ট বৈষম্য লাঘব করে বাংলাদেশকে মানবিক উন্নয়নের প্রগতিশীল ধারায় স্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ্।

গঠনতন্ত্র

ধারা ১। নাম: এটি বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল। এ দলের নাম হবে 'গণঅধিকার পরিষদ'। ইংরেজিতে এ দল Gono Odhikar Parishad নামে পরিচিত হবে। সংক্ষেপে এ দলের নাম GOP বা জিওপি লিখা বা বলা যাবে।

ধারা ২। নীতিসমূহ: অত্র রাজনৈতিক দল তার সকল কর্মসূচি পরিচালনায় নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করবে। শর্ত থাকে যে,

ক) দলের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাংলাদেশ সংবিধানের পরিপন্থি হবে না।

খ) দলের গঠনতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গভেদে কোনোরূপ বৈষম্য প্রতীয়মান হবে না।

গ) দলের গঠনতন্ত্রে নাম, পতাকা, চিহ্ন বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার বা দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো ধারায় এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে উক্ত ধারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ) দলের গঠনতন্ত্রে দলবিহীন বা একদলীয় ব্যবস্থা সংরক্ষণ বা লালন করার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে না। এরূপ প্ররিলক্ষিত হলে উক্ত ধারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) দলের গঠনতন্ত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে অফিস, শাখা বা কমিটি গঠন এবং পরিচালনার বিধান থাকবে না।

চ) সর্বপরি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৯০(গ)(১)(গ)-এ বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত নীতিসমূহগ্রহণ করিবে।

(২-চ-১) সকল ক্ষেত্রে ন্যায্যপন্থা অবলম্বন করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে যাবে ।

(২-চ-২) সকল ক্ষেত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে অগ্রাধিকার দেবে।

(২-চ-৩) দেশ ও দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবে। (২-চ-৪) সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে।

(২-চ-৫) কোনো ক্রমেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, জাতীয়স্বার্থ, ঐক্য, সংহতি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কোনো উদ্যোগে সমর্থন দেবে না।

(২-চ-৬) সকল ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-আকৃতি-অঞ্চল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে বৈষম্যের বিপক্ষে থাকবে এবং সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

(২-চ-৭) বৈষম্য নিরসন করতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি (Inclusion) নিশ্চিত করার ব্যাপারে অঙ্গিকারবদ্ধ হবে।

(২- চ-৮) কোনো অবস্থায় কোনো প্রকারের দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারকে প্রশ্রয় দেবে না।

(২- চ-৯) সকল পরিস্থিতিতে মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে

(২- চ-১০) পরিবেশ ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা করে জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যমে একটি চেইন বিশ্বব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে।

ধারা ৩। মূলনীতিঃ অত্র দলের মূলনীতি হবে ০৪ টি (চার)। যথা: গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, অধিকার ও জাতীয়স্বার্থ । 'গণতন্ত্র' বলতে পরামর্শভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জনমতের প্রতিফলন এবং নেতৃত্বের শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের চর্চাকে বোঝাবে: 'ন্যায়বিচার' বলতে দলের অভ্যন্তরের সকল পর্যায়ে ন্যায্যতা, ন্যায়বিচারের শাসন ও সকলের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করাকে বোঝাবে: 'অধিকার' বলতে বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত মানবাধিকারসমূহকে বোঝাবে; 'জাতীয়স্বার্থ' বলতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থকে বোঝাবে।

ধারা ৪। ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচিঃ দলের আত্মপ্রকাশকালে (২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর) ঘোষিত আত্মপ্রকাশের ঘোষণা এবং ২১ দফা কর্মসূচিকে দলের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি হিসেবে অনুসরণ করা হবে।

ধারা ৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ অত্র দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক, দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন, জ্ঞানভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন। প্রকাশ থাকে যে, এ দলের উদ্দেশ্যসমূহ কোনো ক্রমেই বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থি হবে না। কেনো ক্ষেত্রে অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান হলে উক্ত উদ্দেশ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা ৬। দলের পতাকাঃ দলের পতাকার উপরের এক তৃতীয়াংশ সবুজ, মাঝের এক তৃতীয়াংশ লাল এবং নিচের এক তৃতীয়াংশ সবুজ রঙের হবে। ঊর্ধ্বাংশের ডানপাশে সবুজ জমিনের ওপর চারটি সাদা তারকা চিহ্ন খচিত হবে। সবুজ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক; লাল হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতীক; সাদা হচ্ছে শান্তির প্রতীক; চারটি তারকা দলের চারটি মূলনীতির প্রতীক, যা বাংলাদেশের মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচ্য।

ধারা ৭। দলীয় লোগোঃ অত্র দলের লোগো হবে নিম্নরূপ। দলের যেকোনো প্রকাশনায় দলের নামের সঙ্গে লোগো ব্যবহার করতে হবে। লোগো প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে বর্ণিল অথবা সাদাকালো যেকোনো একটি ব্যবহার করা যাবে।

(৭-ক) নির্বাচনী প্রতীকঃ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্রতীকই হবে এ দলের নির্বাচনী প্রতীক।

ধারা ৮। স্লোগান: অত্র দলের স্লোগান হবে 'জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার ।

ধারা-৯। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ এ দলের সদর দপ্তরকে 'কেন্দ্রীয় কার্যালয়' বলে অভিহিত করা হবে এবং তা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে। এছাড়াও স্থানীয় সংগঠনের জন্য মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দলীয় কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দলের সদস্য পদ

ধারা ১০। সদস্যপদঃ অত্র দলের দুই প্রকারের সদস্যপদ থাকবে। যথা- প্রাথমিক সদস্য ও নির্বাহী সদস্য।

(১০-ক) প্রাথমিক সদস্য। অত্র দলের নির্ধারিত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অনুদান দিয়ে নির্ধারিত যোগদানপত্র পূরণ করে কোনো ব্যক্তি আবেদন করলে তিনি এ দলের প্রাথমিক সদস্য' বলে বিবেচিত হবেন। (১০ খ) নির্বাহী সদস্য: প্রাথমিক সদস্যদের মধ্য থেকে যে সকল ব্যক্তি দলের কোনো স্তরের কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবেন তাদেরকে দলের নির্বাহী সদস্য হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রাথমিক সদস্য না হয়ে কেউ এ দলের নির্বাহী সদস্য হতে পারবেন না।

ধারা ১১। প্রাথমিক সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা প্রক্রিয়াঃ

(১১.ক) ১৮ বছর বা ততোধিক বয়সের যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক এ দলের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবেন। ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সংগঠনের মূলনীতি ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির প্রতি ঐকমত্য ঘোষণা করতে হবে।

(১১.খ) প্রাথমিক সদস্য পদের যোগদানপত্র অত্র গঠনতন্ত্রের 'ক' ফরমে যুক্ত রয়েছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। উক্ত যোগদানপত্র দলের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। উক্ত যোগদানপত্র দলের কার্যালয়ে না পাওয়া গেলে অনুরূপ পত্র ছাপিয়ে নিয়ে প্রাথমিক সদস্য পদের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। এছাড়া দলের ওয়েবসাইটেও উক্ত যোগদান পত্রের অনুলিপি (ডাউনলোডযোগ্য ভাবে পাওয়া যাবে। কোনো ব্যক্তি চাইলে অনলাইনেও ফরম পুরণ করে দলে যোগদান করতে পারবেন।

(১১-গ) যোগদানপত্র অনুমোদিত হলে প্রাথমিক সদস্য পদের প্রমাণস্বরূপ পরিচয়পত্র ফরম (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)

প্রত্যেক সদস্যকে দিতে হবে। দলের উপজেলা/পৌরসভা/থানা পর্যায়ের সভাপতি বা তার সমপর্যায়ের বা ঊর্ধ্বতন কোনো নেতা প্রাথমিক সদস্য পদের অনুমোদন করতে পারবেন।

(১১.ঘ) এ দলের প্রাথমিক সদস্য অনুদান ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। প্রাথমিক সদস্য পদ লাভের পরবর্তী বছর থেকে দলের বাৎসরিক চাঁদা হবে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। প্রাথমিক সদস্যদের অনুদান দলের নির্ধারিত রসিদ মারফত গৃহীত হবে

এবং উক্ত রসিদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে। নির্বাহী সদস্যের অনুদান তিনি যে সাংগঠনিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত উক্ত কমিটির প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(১১-ঙ) প্রত্যেকটি উপজেলা/থানা/ পৌরসভা সংগঠন তাঁদের স্ব-স্ব এলাকার প্রাথমিক ও নির্বাহী সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করবে এবং কেন্দ্রে সরবরাহ করবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সকল সাংগঠনিক শাখা থেকে প্রাপ্ত তালিকা সংগ্রহ করে দলের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানার ডিজিটাল ও অ্যানালগ চোৰেজ সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে। প্রত্যেক প্রাথমিক ও নির্বাহী সদস্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল সদস্য নম্বর থাকবে, যা ব্যবহার করে তিনি দলের ওয়েবসাইটে তার জন্য নির্ধারিত ডিজিটাল প্রোফাইলে প্রবেশ করতে পারবেন। দলের সদস্যদের সম্ভাবনা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি স্বতন্ত্র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও অনুসরণ করতে হবে। উক্ত সদস্যের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য তার ডিজিটাল প্রোফাইলে হালনাগাদ থাকবে।

ধারা ১২। প্রাথমিক সদস্য পদ লাভের অযোগ্যতাঃ

(১২-ক) বাংলাদেশের আইনানুগ নাগরিক নন এমন কোনো ব্যক্তি এ দলের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবেন না।

(১২-খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, জাতীয়স্বার্থ ও জননিরাপত্তা বিরোধী কোনো ব্যক্তিকে এবং সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী কিংবা সহিংস কোনো তৎপরতার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এই দলের সদস্য পদ দেয়া হবে না।

(১২-গ) এ দলের মূলনীতি, গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির সঙ্গে একমত নন অথবা এসবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি এর সদস্য হতে পারবেন না।

ধারা ১৩। সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাঃ কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

(১৩-ক) কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে দলের ভেতরে অথবা বাইরে অসদাচরণ, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, নৈতিক স্খলন বা তৎসমতুল্য অভিযোগ প্রমাণিত হলে।

(১৩-খ) কোনো সদস্য দলের গঠনতন্ত্র বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হলে।

ধারা ১৪। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়াঃ দলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

(১৪-ক) প্রাথমিক সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়া দলের কোনো প্রাথমিক সদস্য গঠনতন্ত্রের ১৩-ক ও ১৩-খ ধারায় উল্লিখিত অভিযোগের যেকোনো একটি বা উভয় অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা/ পৌরসভার সভাপতি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সদস্যপদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিতে পারবেন। উক্ত সদস্য এতে সংক্ষুব্ধ

হলে তিনি ঊর্ধ্বতন (জেলা/মহানগরী) সংগঠনের নির্দিষ্ট অভিযোগ সেলে আপিল দাখিল করতে পারবেন। জেলা/মহানগরী সংগঠন উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করার পর তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হলে তিনি বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। সে স্তরে সমাধান না হলে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট অভিযোগ করা যাবে।

(১৪-খ) স্থানীয় সংগঠনভুক্ত নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়া: দলের স্থানীয় সংগঠনভুক্ত কোনো নির্বাহী সদস্য গঠনতন্ত্রের ১৩-ক ও ১৩-এ ধারায় উল্লিখিত অভিযোগের যেকোনো একটি বা উভয় অভিযোগে অভিযুক্ত হলে ওই ব্যক্তি যে কমিটির অন্তর্ভুক্ত সেই কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাকে সাময়িক অব্যাহতি দিতে পারবেন। পরে তাকে অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনধিক ১৪ দিন সময় দেওয়া যাবে। উক্ত ব্যক্তি কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করলে তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে শুনানির আয়োজন করে তার সদস্যপদ বাতিল অথবা পূর্বে প্রদত্ত শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে। উক্ত সদস্য এতে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদে অভিযোগ করতে পারবেন। সে স্তরে সমাধান না হলে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট আপিল করা যাবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৪ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনো জবাব

না দিলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে তার কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট আপিল করার সুযোগ থাকবে না এবং উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করা যাবে।

(১৪-গ) কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়া: দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনের (উচ্চতর পরিষদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও জাতীয় কাউন্সিল) কোনো নির্বাহী সদস্য গঠনতন্ত্রের ১৩-ক ও ১৩-৭ ধারায় উল্লিখিত অভিযোগের যেকোনো একটি বা উভয় অভিযোগে অভিযুক্ত হলে দলের সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাকে তার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করে সাময়িক অব্যাহতি এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে পারবেন। এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উচ্চতর পরিষদের কছে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

(১৪-ঘ) সদস্যপদ পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি দল থেকে তার সদস্যপদ হারালে তার জন্য পুনরায় দলে যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। এজন্য তাকে পুনরায় দলের প্রাথমিক সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে হবে এবং উক্ত আবেদনের সঙ্গে পূর্বে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগ থেকে নিষ্পত্তির প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

ধারা ১৫। সদস্যপদ থেকে পদত্যাগঃ দলের যে কোনো সদস্য দলের সভাপতির কাছে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করবে।

(১৫-ক) প্রাথমিক সদস্যের পক্ষ থেকে এরূপ চিঠি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের হাতে পৌঁছলে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে।

(১৫-খ) কোনো নির্বাহী সদস্য এরূপ চিঠি প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি (স্থানীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে) উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিতভাবে জানাবেন। এ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অনধিক ১৪ দিন সময় নিতে পারবেন। পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তার সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উক্ত পদে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে।

(১৫-গ) দল কর্তৃক মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য যদি সংসদে সংসদীয় দলের নেতার সম্মতি ছাড়া নিজের নির্দিষ্ট আসন পরিবর্তন করেন বা অন্যদলের সাথে জোট বাঁধেন বা ফ্লোর ক্রসিং করেন বা সংসদে দলীয় অবস্থানের পরিপন্থি কোনো কাজ করেন তাহলে ওই সংসদ সদস্য দল থেকে তাৎক্ষণিকভারে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

ধারা ১৬। দলে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্বঃ ঘোষিত নীতি (ধারা-২-এর উপধারা 'চ') অনুযায়ী দলের অভ্যন্তরে নারী- পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে লক্ষ্যে সংগঠনের

সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গণঅধিকার পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে দলের সকল পর্যায়ে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এজন্য দলের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নারীর কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও অনুসরণ করা হবে। সর্বপরি এ ধারা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯০৭(১)(খ) (আ)-প্রতিপালন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দলের সাংগঠনিক কাঠামো

ধারা-১৭। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোঃ

এ দলে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে। যথা- কেন্দ্রীয় সংগঠন ও স্থানীয় সংগঠন। তৃণমূলের ওয়ার্ড সংগঠন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন, পৌর, থানা, উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যন্ত সংগঠনগুলোকে স্থানীয় সংগঠন এবং ঊর্ধ্বতন সকল সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সংগঠন বলে অভিহিত করা হবে।

ধারা-১৮। কেন্দ্রীয় সংগঠনঃ ০৫ টি (পাঁচ) পরিষদের সমন্বয়ে দলের কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হবে। যথা-

(১৮-ক) জাতীয় কাউন্সিল (National Council): দলের স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হবে। জাতীয় কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর। জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে দলের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান, সাধারণ সম্পাদকের উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন, গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাবে ভোট প্রদান এবং দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনের জন্য ভোট প্রদান।

(১৮-খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ (Central Executive Council): কেন্দ্রীয়ভাবে দলের কার্যনির্বাহ ও বাস্তবায়নে এ পরিষদ ভূমিকা রাখবে। দলের বাজেট, গঠনতন্ত্রের সংশোধনী, সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের অপসারণের প্রস্তাব, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি জাতীয় কাউন্সিলে পেশ করার আগে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এছাড়া উচ্চতর পরিষদের পক্ষ থেকে প্রণীত যেকোনো কৌশলগত প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এর মেয়াদ থাকবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর।

(১৮-গ) উচ্চতর পরিষদ (Higher Council): কেন্দ্রীয়ভাবে দলের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এ পরিষদ। এ পরিষদ বিভিন্ন পর্যায়ের অধস্তন সংগঠনকে তত্ত্বাবধান করা এবং যেকোনো সমস্যা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির

আলোকে দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে। এ পরিষদের আরও কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে-

(১৮-গ-১) দলের প্রধান নীতি-নির্ধারক ফোরাম হিসেবে এ পরিষদ দলের নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করবে।

(১৮-গ-২) একমাত্র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অপসারণ ব্যতীত দলের অন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পুনর্বিচারের ক্ষমতা এ পরিষদের থাকবে।

(১৮-গ-৩) এ পরিষদ প্রয়োজনবোধে দলের মূলনীতি ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, বিধি, উপ-বিধি ও ধারায় অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে তার যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করবে এবং সে ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১৮-গ-৪) দলের সকল পর্যায়ে গঠনতন্ত্রের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলন নিশ্চিত করা ও তার তদারকি করা এ পরিষদের দায়িত্ব।

(১৮-গ-৫) এ পরিষদ দলের প্রচারপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার অনুমোদন দেবে এবং অনুমোদন ব্যতীত দলের কোনো প্রচারপত্র বা প্রকাশনা প্রকাশ বা বিতরণ বৈধ হবে না।

(১৮-গ-৬) এ পরিষদ স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যেকোনো নির্বাহী কমিটির কাজ সাময়িকভাবে মূলতবি রাখার নির্দেশ দিতে পারবে কিংবা প্রয়োজনবোধে তা বাতিল করে দিয়ে পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবে।

(১৮-গ-৭) এ পরিষদ দলের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী এবং দল থেকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিনিধি চূড়ান্ত করবে। অর্থাৎ এ পরিষদই অত্র দলের মনোনয়ন বোর্ড হিসেবে স্বীকৃত হবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯০খ(১) (খ) (ঈ)- ধারার আলোকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা বা ক্ষেত্রমতে, জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রভৃতকৃত প্যানেল থেকে দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক প্রার্থী এ মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে।

(১৮-গ-৮) প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর পরিষদের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

(১৮-ঘ) সংসদীয় পরিষদ (Parliamentary Council): দল থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত সংসদ সদস্যদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ দলের মূলনীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও নির্বাচনী ইশতেহারকে সামনে রেখে জাতীয় সংসদে দলের অবস্থান নির্ধারণ করবে।

(১৮-ঙ) উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council): দলের প্রতি শ্রুতিশীল, সৎ ও দেশপ্রেমিক সিনিয়র

নাগরিকদের সমন্বয়ে দলের উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে।

ধারা-১৯। জাতীয় কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়াঃ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় দলের জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হবে।

(১৯-ক) প্রতি জেলা ও মহানগরীর কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ ০৩ (তিন) জন; তবে আহ্বায়ক কমিটির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব থাকতে পারবেন।

(১৯ খ) সংসদীয় দলের সদস্যবৃন্দ:

(১৯- গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

(১৯-ঘ) উচ্চতর পরিষদের সদস্যবৃন্দ;

(১৯-গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ;

(১৯-ঘ) উচ্চতর পরিষদের সদস্যবৃন্দ;

(১৯-ঙ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জাতীয় কাউন্সিলের সভায় অংশ নিতে পারবেন, তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না ।

ধারা-২০। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন প্রক্রিয়াঃ

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

(২০-ক) জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে।

(২০-ক-১) একইভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯০ (খ) (অ) উপধারার আলোকে অত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটি নির্বাচিত হবে।

(২০-খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭১ জন থেকে সর্বোচ্চ ১৫১ জন হতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সম্পাদকীয় পদসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় পদগুলোতে অনূর্ধ দুইটি করে সহকারী পদ থাকতে পারবে এবং অবশিষ্ট পদসমূহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্যের দ্বারা পূরণ করতে হবে ।

(২০-গ) প্রয়োজন সাপেক্ষে উচ্চতর পরিষদের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ সম্পাদকীয় পদসমূহের মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ পদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সহ-সভাপতি অথবা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমার্যাদা প্রদান করা যাবে। এছাড়া সম্পাদকীয় পদের অধীনে প্রয়োজনে সেক্রেটারিয়েট নিয়োগ দেওয়া যাবে।

(২০-ঘ) দলের নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে ৩৫টি সম্পাদকীয় পদ থাকবে ।

১. দপ্তর সম্পাদক

২. অর্থ সম্পাদক

৩. গণমাধ্যম ও সম্প্রচার সম্পাদক

৪. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

৫. আইন সম্পাদক

৬. মানবাধিকার সম্পাদক

৭.আন্তর্জাতিক সম্পাদক

৮. শিক্ষা সম্পাদক

৯. রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক

১০. নারী বিষয়ক সম্পাদক
১১. পরিকল্পনা ও টেশসই উন্নয়ন সম্পাদক
১২. কর্মসূচি ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
১৪. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
১৫. পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সম্পাদক
১৬. কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক
১৭. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবিক মর্যাদা বিষয়ক সম্পাদক
১৮ স্বাস্থ্য সম্পাদক
১৯. মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়স্বার্থ বিষয়ক সম্পাদক
২০. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পাদক
২১. পেশাজীবী বিষয়ক সম্পাদক
২২. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
২৩. ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক
২৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান সম্পাদক
২৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পাদক
২৬. সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক
২৭. স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক
২৮. শিল্প-বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পাদক
২৯. নিরাপদ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
৩০. দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক
৩১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
৩২. বেসামরিক বিমান ও পর্যটন সম্পাদক

৩৩. ভূমি, গৃহায়ন ও পুনর্বাসন সম্পাদক

৩৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক -

৩৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নৃগোষ্ঠী স্বার্থ বিষয়ক সম্পাদক

ধারা-২১। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পদবিন্যাসঃ

১. সভাপতি (১ জন)

২. সাধারণ সম্পাদক (১ জন)

৩. সিনিয়র সহ-সভাপতি (১ জন)

৪. অন্যান্য সহ-সভাপতিমণ্ডলী (২ জন নারীসহ সর্বমোট ১১ জন)

৫. সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (১ জন)

৬. অন্যান্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ (১ জন নারীসহ মোট ৬ জন)

৭. সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ (১০টি সাংগঠনিক বিভাগে ১০ জন)

৮।. সম্পাদকীয় পদধারীগণ (৩৫ জন)

৯. সহকারী সম্পাদকীয় পদধারীগণ (২ জন করে ৭০ জন)

১০. কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্যবৃন্দ (১৫ জন, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে)

ধারা-২২। উচ্চতর পরিষদ গঠন প্রক্রিয়াঃ উচ্চতর পরিষদের মোট সংখ্যা হবে ১৫ জন। নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় দলের উচ্চতর পরিষদ গঠিত হবে।

(২২-ক) দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে উচ্চতর পরিষদের সদস্য হবেন।

(২২-খ) এ পরিষদের ৮ জন সদস্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। অপর ৫ জন সদস্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক উচ্চতর পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত করবেন।

(২২-গ) উচ্চতর পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ (২২-খ ধারা বলে) পরবর্তী উচ্চতর পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বলবত থাকবেন।

(২২-ঙ) দলের সদ্য সাবেক সভাপতি পদাধিকার বলে উচ্চতর পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন। এরূপ পরিস্থিতিতে এ পরিষদের মোট সংখ্যা একজন বৃদ্ধি পাবে।

(২২-চ) এ দল সরকার গঠন করলে এবং দলের মনোনীত ব্যক্তি দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি পদাধিকার বলে উচ্চতর পরিষদের সদস্য হবেন। এক্ষেত্রে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে একজন বৃদ্ধি পাবে।

(২২-চ) দলের সভাপতি এ পরিষদের প্রধান হবেন এবং সাধারণ সম্পাদক এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। উচ্চতর পরিষদের অবশিষ্ট সকল ব্যক্তি সমান মর্যাদার অধিকারী হবেন।

ধারা-২৩। দলীয় পদমর্যাদাক্রমঃ সকল ক্ষেত্রে দলের নিম্নোক্ত পদমর্যাদাক্রম অনুসরণ করা হবে।

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক সদ্য সাবেক সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উচ্চতর পরিষদের সদস্যবৃন্দ সম্পাদকীয় পদাধিকারীগণ

সহ-সভাপতিবৃন্দ

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ

সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

সহ-সম্পাদকীয় পদাধিকারীগণ

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

মহানগর সভাপতিবৃন্দ

জেলা সভাপতিবৃন্দ

ধারা-২৪। স্থানীয় সংগঠনঃ স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে অত্র দলের সংগঠনের শাখা ও উপ-শাখা গড়ে তোলা হবে। ওয়ার্ড (ইউনিয়নভুক্ত), ওয়ার্ড (থানা/ পৌরসভাভুক্ত), ইউনিয়ন, উপজেলা, থানা, পৌরসভা, জেলা ও মহানগরী পর্যায়ের সংগঠনকে স্থানীয় সংগঠন হিসেবে অভিহিত করা হবে।

ধারা ২৫। স্থানীয় সংগঠনের দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ সকল স্থানীয় নীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির আলোকে পরিচালিত হবে। স্থানীয় সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ-

(২৫-ক) দলের প্রাথমিক সদস্য সহ, সদস্য তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ:

(২৫-খ) কেন্দ্রীয় সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচি তৃণমূলে বাস্তবায়ন।

(২৫-গ) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে জনসংযোগ ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ: (২০)

এছাড়া স্থানীয় সংগঠনের সদস্যবৃন্দ দলের জন্য কল্যানকর বিবেচনায় কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যেকোনো পরামর্শ বা মতামত পাঠাতে পারবেন।

ধারা-২৬। স্থানীয় সংগঠনের চেইন অব কমান্ডঃ

(২৬-ক) ইউনিয়ন সংগঠন ইউনিয়নভুক্ত ওয়ার্ড সমূহের সাংগঠনিক কমিটি অনুমোদন করবে।

(২৬-খ) উপজেলা সংগঠন তার অধীনস্থ সকল ইউনিয়নের সংগঠনিক কর্মসূচির অনুমোদন ও নির্বাচন ব্যবস্থা তদারকি করবে:

(২৬-গ) পৌরসভা সংগঠন পৌরসভাভুক্ত সকল ওয়ার্ডের সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুমোদন নির্বাচন ব্যবস্থা তদারকি করবে:

(২৬-ঘ) জেলা সংগঠন তার অধীনস্থ সকল উপজেলা ও পৌরসভার সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুমোদন নির্বাচন ব্যবস্থা তদারকি করবে।

(২৬-ঙ) থানা সংগঠন সংশ্লিষ্ট থানার অধীনস্থ সকল ওয়ার্ডের সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুমোদন নির্বাচন ব্যবস্থা তদারকি করবে:

(২৬-চ) মহানগর সংগঠন তার অধীনস্থ সকল থানার সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুমোদন নির্বাচন ব্যবস্থা তদারকি করবে:

(২৬-ছ) সকল জেলা ও মহানগর সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুমোদন নির্বাচন ব্যবস্থা কি করবে কেন্দ্রীয় সংগঠন। তবে কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদকে এ কাজের জন্য সম্পৃক্ত করতে পারবে।

ধারা- ২৭। স্থানীয় সংগঠনসমূহের সমমর্যাদাক্রমঃ

(২৭-ক) সকল ইউনিয়ন, পৌরসভা ওয়ার্ড ও মহানগর ওয়ার্ড সংগঠন সমমর্যাদাবিশিষ্ট হবে।

(২৭.খ) সকল উপজেল, পৌরঠা সংগঠন সাদাভুক্ত হবে।

(২৭-গ) সকল জেলা সংগঠন ও মহানগর সংগঠন সমমর্যাদাভুক্ত হবে

ধারা-২৮। স্থানীয় সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়াঃ

(২৮-ক) ইউনিয়নভুক্ত ওয়ার্ড সাধারণ কাউন্সিল ও ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী পরিষদ। প্রতিটি ওয়ার্ডে ন্যূনতম ২১ জন প্রাথমিক সদস্য নিয়ে দলের সাধারণ কাউন্সিল গঠিত হবে। ওয়ার্ডের সভাপতি উক্ত পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন। পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে অনূর্ধ্ব ১১ জনের একটি ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী পরিষদ দুই বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী পরিষদ ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট সংগঠকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এ পরিষদ গঠন ও অনুমোদন দেবে।

(২৮-খ) ওয়ার্ড (পৌরসভা/মহানগরভুক্ত) সাধারণ কাউন্সিল ও ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী পরিষদ পৌরসভা/মহানগরভুক্ত ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রতি ওয়ার্ড ন্যূনতম ৫০ জন প্রাথমিক সদস্য নিয়ে দলের সাধারণ কাউন্সিল গঠিত হবে। ওয়ার্ডের সভাপতি উক্ত পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন। পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে অনূর্ধ্ব ২১-৪১ জনের একটি ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী পরিষদ দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। এ কমিটি ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী পরিষদের সমান মর্যাদা লাভ করবে।

(২৮-গ) ইউনিয়ন সাধারণ কাউন্সিল ও ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী পরিষদ ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ এবং ইউনিয়নের বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত হবে দলের ইউনিয়ন সাধারণ কাউন্সিল। এ পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে দুই বছর মেয়াদের জন্য ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে, যার আকার সর্বনিম্ন ২১ থেকে সর্বোচ্চ ৪১ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারবে।

(২৮-ঘ) উপজেলা সাধারণ কাউন্সিল ও উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষন উপজেলাভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের ইউনিয়ন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ এবং বিদ্যমান উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে দলের উপজেলা সাধারণ কাউন্সিল। এ পরিষদের সদস্যরা দুই বছর মেয়াদে সদস্যদের মধ্য থেকে উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে। এ পরিষদের আকার সর্বনিম্ন ৩১ থেকে সর্বোচ্চ ৫১ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারবে।

(২৮-ঙ) পৌরসভা/থানা সাধারণ কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহী পরিষদ: পৌরসভা/থানাভুক্ত প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ এবং বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে পৌরসভা/থানা সাধারণ কাউন্সিল। এ পরিষদ দুই বছর মেয়াদে সদস্যদের মধ্য থেকে পৌরসভা/থানা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

করবে। এ পরিষদের আকার সর্বনিম্ন ৩১ থেকে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারবে।

(২৮-চ) জেলা সাধারণ কাউন্সিল ও জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ। দলের প্রতিটি পৌরসভা ও উপজেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ এবং বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সমস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে দলের জেলা সাধারণ কাউন্সিল। এ পরিষদ দুই বছর মেয়াদে সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে। এর আকার সর্বনিম্ন ৪১ থেকে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারবে।

(২৮-ছ) মহানগর সাধারণ কাউন্সিল ও মহানগর কার্যনির্বাহী পরিষদ: ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ মহানগরভুক্ত প্রতিটি থানার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ এবং বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে দলের মহানগর সাধারণ কাউন্সিল। এ পরিষদ দুই বছর মেয়াদে সদস্যদের মধ্য থেকে মহানগর কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করবে। এর আকার সর্বনিম্ন ৪১ থেকে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারবে।

(২৮-জ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের আনলে স্থানীয় সংগঠনের সম্পাদকীয় পদবিন্যাস সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের সময় প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সম্পাদকীয় পদসমূহের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট কমিটির কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজন এমন পদ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে কমিটির

মোট সদস্য সংখ্যা কোনোক্রমেই উক্ত কমিটির নির্ধারিত সংখ্যা অতিক্রম করতে পারবে না।

ধারা-২৯। বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদঃ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদ গঠিত হবে। সমন্বয় পরিষদের দায়িত্ব কেবল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ, মতামত ও নির্দেশনা আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের সাংগঠনিক কার্যক্রম, কর্মসূচি, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা দলীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করবেন। এ পরিষদ তার আওতাধীন অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ করে তা সুপারিশ আকারে কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। তবে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এই পরিষদের থাকবে না। দলের সভাপতি প্রয়োজন বোধ করলে এ পরিষদকে সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের বিরোধ নিষ্পত্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন। এছাড়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনের নির্বাচন ব্যবস্থাপনাও করতে পারবে।

(২৯-ক) প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত জেলা সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে বিভাগীয় সমন্বয় পরিষদের সদস্য হবেন।

(২৯- খ) দলের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ প্রত্যেক বিভাগের সমন্বয় পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(২৯-গ) প্রত্যেক বিভাগের জন্য এরূপ সমন্বয় কমিটি থাকলেও রাজধানী ও আশপাশের কয়েকটি মহানগর ও জেলা শাখার জন্য (যথা- ঢাকা মহানগর উল্টর ও দক্ষিণ, ঢাকা জেলা উল্টর ও দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ মহানগর ও জেলা, গাজীপুর মহানগর ও জেলা) এ ধারা প্রযোজ্য হবে না। এ শাখাসমূহ সরাসরি কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

ধারা-৩০। আহ্বায়ক কমিটিঃ কোনো কারণে সংগঠনের কোনো স্তরের কমিটি বিলুপ্ত হলে এবং সেখানে নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা না গেলে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত স্থানে অন্তর্বর্তীকালীন সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার জন্য আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করতে পারবেন। এছাড়া কোনো এলাকায় সংগঠন না থাকলে সেখানে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি করা যাবে। তবে আহ্বায়ক কমিটিতে সদস্য সংখ্যার কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এমন যেকোনো কমিটির মেয়াদ থাকবে সর্বোচ্চ এক বছর। তবে প্রথম কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ হবে অত্র গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত হওয়ার দিন থেকে দিন (ধারা ৩১ ও ৩২ এর সমন্বয়ে)।

ধারা-৩১। কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানঃ কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হওয়ার দিন থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-২২ অনুযায়ী প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-৩২। প্রথম জাতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধানঃ প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রথম জাতীয় কাউন্সিল আয়োজন করতে হবে। উক্ত কাউন্সিলে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-২০ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।

ধারা ৩৩। আহ্বায়ক কমিটির দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতাঃ

(৩৩-ক) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মর্যাদা পাবে। এবং আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মর্যাদা পাবেন ও দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩৩-খ) দলের স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো আহ্বায়ক কমিটি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই উক্ত এলাকায় সাধারণ কাউন্সিল ও নির্বাহী পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেবে।

ধারা-৩৪। নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বোর্ডঃ সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বোর্ড

গঠন করতে হবে। দলের উচ্চতর পরিষদের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দিষ্ট মেয়াদে এ বোর্ডের প্রধান নিযুক্ত করবেন, যিনি নিজে দলের অভ্যন্তরের কোনো পদে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। এছাড়া দলের কোনো পর্যায়ের কোনো পদে নির্বাচন করতে আগ্রহী নন এবং সকল মহলে গ্রহণযোগ্য এমন দুই থেকে চারজনকে বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত করতে হবে। এ বোর্ডে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(৩৪-ক) প্রথম নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বোর্ড সংক্রান্ত বিশেষ ধারা: অত্র গঠনতন্ত্রের ৩১ ধারা অনুযায়ী গঠনতন্ত্র অনুমোদন হওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠন করতে হবে। সে লক্ষ্যে ১৮০ দিন পূর্ণ হওয়ার অন্তত ৩০ দিন আগে প্রথম উচ্চতর পরিষদ গঠন সংক্রান্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য দলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করতে হবে।

(৩৪-খ) মেয়াদান্তে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পুনঃনির্বাচন সংক্রান্ত ধারা: প্রথম কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার তিন বছর পর উক্ত পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যেই কাউন্সিলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠনে উচ্চতর পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এজন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করতে হবে। পরবর্তী প্রত্যেক কাউন্সিলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

(৩৪-গ) নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠনের পূর্বে উচ্চতর পরিষদ পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারাঃ ৩৪-খ ধারা অনুযায়ী মেয়াদান্তে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ পুনঃনির্বাচিত হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের ধারা-২২ অনুসারে উচ্চতর পরিষদ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেবেন। পরবর্তী প্রত্যেক কাউন্সিলের পূর্বে একই নিয়মে উচ্চতর পরিষদ পুনর্গঠিত হবে।

(৩৪-ঘ) দলের অভ্যন্তরীণ যেকোনো স্তরের নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি নির্বাচিত হলে তার পূর্ববর্তী পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংগঠন এক মাসের মধ্যে কাউকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করবে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চাইলে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা আলোচনা সাপেক্ষে সাময়িক মনোনয়নের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করতে পারবেন।

(৩৪-ঙ) দুরবর্তী বা অনলাইন নির্বাচন: এ দল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় অনলাইন ভোটিংয়ের কিংবা ডাক মারফত ভোট প্রদানের ব্যবস্থা রাখবে, যাতে কোনো ব্যক্তি চাইলে স্বশরীরে উপস্থিত না হয়েও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যালটের গোপনীয়তা ও সুষ্ঠু ভোটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩৪-চ) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা: দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা অন্য কোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই দলের অন্তত সর্বশেষ

এক মেয়াদ জাতীয় কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া উচ্চতর পরিষদের যেকোনো সদস্য এসব পদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। স্থানীয় সংগঠনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৩৪-ছ) স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন: স্থানীয় সরকার ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থী মনোময়নের মূল ক্ষমতা উচ্চতর পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সাংগঠনিক সমন্বয় পরিষদ তার আওতাধীন জেলা সমূহের নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করে উচ্চতর পরিষদের কাছে সুপারিশ আকারে প্রেরণ করতে পারবে।

ধারা-৩৫। দ্বৈতপদঃ দলের সকল পর্যায়ে দ্বৈতপদকে অনুৎসাহিত করা হবে। তবে তবে প্রথম দুই মেয়াদে প্রয়োজন সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তিকে দ্বৈতপদে পদায়ন করা যাবে। দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষন ও উচ্চতা পরিষদের প্রতিনিধি হবেন।

(৩৫-ক) এছাড়া দলের উচ্চতর পরিষদের সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত হয়ে মতামত ও ভোট দিতে পারবেন।

(৩৫-খ) একই ব্যক্তির দলীয় প্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রধান না হওয়া এ দল সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দলের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি পদে যারা দায়িত্ব নেবেন, তারা দলের

সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবেন না। দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক যদি প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি পদে শপথগ্রহণ করেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তার সংশ্লিষ্ট শূন্য পদ পূরণের জন্য সাময়িকভাবে কোনো ব্যক্তিকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া যাবে এবং ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদ পূরণের জন্য নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণের পরও উক্ত ব্যক্তির সদস্যপদ বহাল থাকবে এবং তিনি পদাধিকার বলে দলের উচ্চতর পরিষদের সদস্য হবেন।

ধারা-৩৬। সভাপতির দায়িত্বঃ

(৩৬-ক) সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়মিত উচ্চতর পরিষদের সভা আহ্বান করা এবং তা পরিচালনা করা;
(৩৬-খ) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়াঃ
(৩৬-গ) কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উচ্চতর পরিষদের পরামর্শক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,
(৩৬-ঘ) সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অবশিষ্ট সদস্য মনোনয়ন ও উচ্চতর পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া,

(৩৬-ঙ) সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উচ্চতর পরিষদের জন্য টেকনোক্র্যাট সদস্য মনোনয়ন:

(৩৬-চ) দলের অগ্রগতি সাধন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া

(৩৬-ছ) কোনো সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দিলে তা গ্রহণ করা কিংবা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া

(৩৬-জ) উচ্চতর পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের মেয়াদ শেষ হলে তাদেরকে দলের অভ্যন্তরে সাময়িক পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩৬-ঝ) এছাড়া সভাপতির হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে; যথা:- (ক) কোনো বিষয়ে সভার সদস্যদের মধ্যে সমানসংখ্যক পরস্পরবিরোধী মতামত থাকলে কাস্টিং ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে; (খ) সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের প্রত্যেকটির শীর্ষনেতাদের মধ্য থেকে অনধিক দুইজনকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় এবং অনধিক পাঁচজনকে জাতীয় পরিষদের সভায় ডেলিগেট হিসেবে আমন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে।

ধারা-৩৬ (১) সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্ব। দলের সভাপতির অবর্তমানে তিনি সভাপতির রুটিন দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

ধারা-৩৭। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বঃ

(৩৭-ক) সভাপতির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সভা সঞ্চালনা করা;

(৩৭-খ) সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আহ্বান, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করা এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব বণ্টন করা এবং তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করা। প্রতিটি সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা

(৩৭-গ) সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রয়োজন সাপেক্ষে দলের সম্পাদকীয় বিভাগগুলোর কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে উপ-কমিটি গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করা;

(৩৭-ঘ) সকল সম্পাদকীয় বিভাগসহ দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত উল্লেখ করে দলের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া এবং জাতীয় পর্ষদের বার্ষিক সভায় তা পেশ করা;

(৩৭-ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনয়ন ও উচ্চতর পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে সভাপতিকে সহায়তা করা;

(৩৭-চ) উচ্চতর পরিষদের জন্য টেকনোক্র্যাট সদস্য মনোনীত করতে সভাপতিকে সহায়তা করা;

(৩৭-ছ) সভাপতির পরামর্শক্রমে নিয়মিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করা;

(৩৭-জ) দলের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করা।

ধারা-৩৭ (১) সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব: দলের সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে তিনি সাধারণ সম্পাদকের রুটিন দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

ধারা -৩৮। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অপসারণঃ

দলের সভাপতি,সাধারণত সম্পাদকের প্রতি অনাস্থা উত্থাপন করতে হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত লিখিত প্রস্তাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করতে হবে। এ প্রস্তাব প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যিনি অভিযুক্ত নন তিনি সভা আহ্বান করবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক উক্ত সভা না ডাকলে তলবি সভা ডেকে উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব আনায়ন ও পাশের ক্ষেত্রে অনলাইন ও অফলাইন স্বাক্ষর দুটোই প্রযোজ্য।

ধারা-৩৯। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সভা, নোটিশ ও কোরাম

(৩৯-ক) জাতীয় কাউন্সিলের সভা: দলের সাধারণ সম্পাদক দলের সভাপতির লিখিত পরামর্শক্রমে জাতীয় কাউন্সিলের সভা আহ্বান করতে পারবেন। প্রতি তিন বছরে অন্তত এশবার দলের জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করা আবশ্যক থাকবে। কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য এ সভার কোরাম গঠন করবে। লিখিতভাবে ই- মেইলে কিংবা সাধারণ ডাকে কিংবা পিয়ন মারফত কিংবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ৩০ দিনের নোটিশে এ সভা ডাকা যাবে। অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ১০ দিনের নোটিশে জাতীয় পর্যদের জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

(৩৯-খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাঃ দলের সাধারণ সম্পাদক দলের সভাপতির লিখিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। প্রতি তিন মাসে অন্তত এশবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান আবশ্যক থাকবে। কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত হলে উক্ত সভার কোরাম গঠন হবে। লিখিতভাবে ই-মেইলে কিংবা সাধারণ ডাকে কিংবা পিয়ন মারফত কিংবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ০৭ (সাত) দিনের লিখিত নোটিশে এ সভা আহ্বান করা যেতে পারে। তবে জরুরি সভার জন্য ৪৮ ঘণ্টার নোটিশই যথেষ্ট হবে।

(৩৯-গ) উচ্চতর পরিষদের সভাঃ দলের সভাপতি যেকোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চতর পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে প্রতি মাসে অন্তত এশবার এ সভা আহ্বান করা আবশ্যক হবে। বিদ্যমান সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে এ সভার কোরাম গঠিত হবে। লিখিতভাবে ই-মেইলে কিংবা সাধারণ ডাকে কিংবা পিয়ন মারফত ২৪ মার লিখিত নোটিশে এ সভা আহ্বান করা যাবে।

(৩৯-ঘ) তলবি সভাঃ কোনো পরিস্থিতিতে দলের সভাপতি বা সভা আহ্বানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এমন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভা না ডাকলে এবং ওই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা সাতদিনের নোটিশে তলবি সভার আহ্বান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। এরূপ সভার ক্ষেত্রে কোরাম গঠিত হবে ২/৩

(দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে। এরূপ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সমর্থন না পেলে উক্ত সভায় আনিত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধারা-৪০। স্থানীয় সংগঠনের সভা, নোটিশ ও কোরামঃ দলের ওয়ার্ড কমিটি থেকে জেলা কমিটি পর্যন্ত সকল পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির সভা উক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাতদিনের নোটিশে আহ্বান করতে পারবেন। ই-মেইলে কিংবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কিংবা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্বল্প সময়ের নোটিশে জরুরি সভা আহ্বান করা যেতে পারে। আহ্বায়ক কমিটির ক্ষেত্রে আহ্বায়ক সভা আহ্বান করতে পারবেন। সকল পর্যায়ের নির্বাহী কমিটি ও আহ্বায়ক কমিটির সভার কোরাম সংশ্লিষ্ট কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার মহানগর/জেলা/উপজেলা/ থানা/ পৌরসভা/ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটির সভা করতে হবে। প্রতিটি সভার উপস্থিতির স্বাক্ষরসহ কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-৪১। অনলাইন সভাঃ পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে দলের যে কোন ধরনের সভা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজন করা যাব। অনলাইন সভার কোরাম অফলাইন সভার মতোই হবে। এছাড়াও জরুরি পরিস্থিতিতে যে কোন যে কোন অফলাইন সভার ক্ষেত্রে সদস্যরা অনলাইনে যুক্ত হয়ে মতামত ও ভোট দিতে পারবে।

ধারা-৪২। দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা: দলের সদস্য ফি, অনুদান, দান, অনুদান, দলের অভ্যন্তরীণ প্রকাশনার বিক্রয়লব্ধ মুনাফা, দলের অফিসিয়াল অনলাইন প্ল্যাটফরম (ফেসবুক পেইজ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট ইত্যাদি) থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটি, মনোনয়ন ফরম বিক্রির ও মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় প্রাপ্ত টাকা সংগ্রহের মাধ্যমে দলের তহবিল সৃষ্টি করা হবে। দলের তহবিল সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন দলের কোষাধ্যক্ষ। কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে সংগঠনের হিসাব খোলা হবে এবং সভাপতি/আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক/সদস্য সচিব ও অর্থ সম্পাদক/অর্থ সমন্বয়ক- এ তিনজনের যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালনা করা যাবে।

(৪২-ক) স্থানীয় সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থা: স্থানীয় সংগঠনও নিজ নিজ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করবে। সব ধরনের আর্থিক অনুদান দলের কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ থেকে সরবরাহকৃত রসিদের বিপরীতে আদায় করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সংগঠনের আর্থিক কমিটি নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করবে এবং তার প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে।

(৪২-খ) নিরীক্ষা বোর্ড: দলের সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত অডিট করাতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশনের শর্ত অনুযায়ী একটি নিরীক্ষা বোর্ড থাকবে। এ কমিটি প্রতিবছর দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্রকাশ

করবে। উচ্চতর পরিষদ থেকে একজন এই বোর্ডের প্রধান হিসেবে পালন করবেন। দলের সভাপতি উচ্চতর পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এ বোর্ডে জাতীয় নির্বাহী কমিটি থেকে আরও ২ থেকে ৪ জনকে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন।

ধারা-৪৩। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা: তারুণ্যনির্ভর দলের সদস্যসম্ভারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো অত্র দলের জন্য একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে দলের অভ্যন্তরে একটি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বোর্ড (Human Resource Management Board বা এইচআরএম বোর্ড) গঠিত হবে। উচ্চতর পরিষদের একজন প্রতিনিধি এ বোর্ডের প্রধান হবেন। এছাড়া দলের সভাপতি উচ্চতর পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রতিনিধিকে এ বোর্ডে সম্পৃক্ত করবেন। দলের বিভিন্ন স্তরের স্থায়ী সদস্যের ব্যক্তিগত অগ্রগতি, দলের নীতি-আদর্শের বিষয়ে কর্মীদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য এ বোর্ড বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং তা উচ্চতর পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ধারা-৪৪। সহযোগী সংগঠন: দলের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করবে এমন সংগঠনকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণভাবে দলের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন হিসেবে অভিহিত করা যাবে। এক্ষেত্রে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৯০ (খ)(ই) অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্র, এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের

বা সংস্থার কর্মচারী বা শ্রমিক কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবীদের সমন্বয়ে অত্র দলের কোনো সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন বা এর শাখা থাকবে না।

ধারা-৪৫ । কমিটি বা সংগঠন বিলুপ্তি: স্থানীয় সংগঠনের যেকোনো স্তরের কমিটি বা সংগঠন বিলুপ্তি ঘোষণার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সংগঠনের হাতে ন্যস্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের যেকোনো কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণার এষতিয়ার থাকবে উচ্চতর পরিষদের হাতে। দলের সভাপতি উচ্চতর পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলুপ্তি ঘোষণা করতে পারবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত

ধারা-৪৬। গঠনতন্ত্রের ভাষা ও প্রাধান্যঃ জনসম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অত্র গঠনতন্ত্র প্রাথমিকভাবে চলিত বাংলায় রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ভাষায় অত্র গঠনতন্ত্র অনুবাদ করে তা জাতীয় পরিষদে অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করা যাবে। কোনো ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে বাংলা ভাষায় রচিত গঠনতন্ত্রই প্রাধান্য পাবে।

ধারা-৪৭। গঠনতন্ত্রের অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ কোনো পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্রের এশাধিক ধারার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট ধারার সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষের বিষয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে সে সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য দলের উচ্চতর পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের

যেকোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে প্রশ্ন ও তার প্রেক্ষিতে উচ্চতর পরিষদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য গঠনতন্ত্রের পরবর্তী সংস্করণের তফসিলভুক্ত করতে হবে ।

ধারা-৪৮। গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ প্রয়োজন সাপেক্ষে অত্র গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা সংযোজন-বিয়োজন, আংশিক বা সম্পূর্ণ সংশোধনের সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যের লিখিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উচ্চতর পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে গঠনতন্ত্র সংশোধনী পাশ হবে।

২১ দফা কর্মসূচি

১। গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার:

গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনর দ্ধারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ‘নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার' গঠনের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সকল স্তরে সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করা। সুনির্দিষ্ট আইনের আলোকে স্বাধীন

নির্বাচন কমিশন গঠন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

২। ন্যায়বিচার ও সুশাসন:

বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বৈষম্য দূর করে সকলের সমানাধিকার, নাগরিক মর্যাদা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সিটিজেন চার্টার তৈরি করা। সকল ধরনের সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান ঘুষ, দুর্নীতি, হয়রানি, বাধা-বিঘ্ন দূর করা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল দায়িত্ব যে, নাগরিকদের সেবাপ্রদান করা এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্তব্য যে, তাদের কাছে আসা মানুষদের সম্মানের সহিত সেবা দেয়া, সেই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং তা লঙ্ঘনকারীদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনা। সর্বস্তরে E-Governance প্রবর্তন, নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা, অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগ নিস্পত্তিত জন্য জনসমাজের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গঠন করা। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার, কেনাকাটা ও বৈদেশিক চুক্তির বিষয় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে তা জনসম্মুখে প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমে দেয়া, সংসদে আলোচনা ও অনুমোদন বিধান করা।

৩। নারী অধিকার:

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ নারী, তাদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সকল রাষ্ট্রীয় নীতির পুনর্বিন্যাস করা হবে। সকল বাঁধা ছিন্ন করে নারী প্রশ্নে সমতা প্রতিষ্ঠাকে অগ্রগণ্য লক্ষ্য ঘোষণা করে, তা অর্জন করতে হবে। নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিলোপ

সাধন করা। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ, সামাজিক সংবেদনশীলতা ও সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সংসদ, সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ন্যূনতম ৩৫ শতাংশ আসন নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা।

৪। সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বা ও ধর্মাবলম্বী:

দেশে স্বাধীন বিকাশ অনুকূল, মর্যাদাপর্ণ পরিস্থিতি ও ভীতিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে, যাতে বিশাল সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির শাসনেও কেউ অস্বস্তি বোধ না করেন। সহনশীলতার নীতি ও সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে, যাতে পরমত, পরধর্ম ও অপরের বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করতে মানুষ উৎসাহ বোধ করে। জাতিসত্ত্বার সমতা বিধানে বিভিন্ন ভাষা, নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর নাগরিকদের ধর্মীয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করা। সকল ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টিশীল বিকাশ এবং বিনিময়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করা।

৫। ক্ষমতার ভারসাম্যঃ

শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহিম,লক সরকার ও গণপ্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় গঠনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পন্ন করা। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা। রাষ্ট্রপতি কিংবা সরকার প্রধান একই সাথে দলীয় প্রধান হতে পারবেন না; কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক (৫*২= দশ বছর) সরকার প্রধান কিংবা পাঁচ মেয়াদের

অধিক (২*৫= দশ বছর) দলীয় প্রধান বা অন্য কোন পদ বা একাধিক পদে মিলিত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৬। দুর্নীতি প্রতিরোধঃ

স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধকে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার দেয়া এবং দুর্নীতিবাজদের সামাজিক ভাবে বর্জনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সরকারের উচ্চ পদে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি ও তার পরিবারের সকল নিকট আত্মিয়ের সম্পত্তির বিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশকে বাধ্যতামূলক করা। অফিস, আদালত, হাট-বাজার, সড়ক-মহাসড়ক, রেল ও নৌপথে সব ধরনের ঘুষ এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করা।

৭। গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতাঃ

বাক, ব্যক্তি, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, মুক্ত সাংবাদিকতার সুরক্ষায় ডিজিট্যাল নিরাপত্তা আইন, অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের মতো সকল দমন ও নিপীড়নমূলক গণবিরোধী আইন বাতিল করা। নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে যে কোন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের জন্য আইনিসুরক্ষা এবং হয়রানি থেকে প্রতিকার নিশ্চিত করা।

৮। পররাষ্ট্র নীতি:

বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন প্রদানকারী, দুর্নীতি ও ঋণের ফাঁদে জড়াবেনা তেমন অর্থনৈতিক সহযোগীতাকারী, সামরিক জোট ভুক্ত করতে চাপ দেবে না তেমন রাষ্ট্র, সমতা ও বহুমাত্রিক বহুদেশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার উদার

নীতিতে সৎভাবে বিশ্বাসীদের সাথে চলার বন্ধুত্বাভিমুখী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হবে। বাংলাদেশ বিরোধী ঘৃণা প্রচার ও সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের রাষ্ট্রসত্তার স্বকীয়তা, স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক সমৃদ্ধি অর্জনের অনুক‚ল শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা।

৯। প্রতিরক্ষা নীতি :

নাগরিক ও মৌলিক অধিকারহীন স্বাধীনতা এবং জনগণের ভরসা হারানো সার্বভৌমত্বকে আপন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বদেশপন্থী দৃঢ় এক প্রতিরক্ষা নীতি প্রনয়ণ করে, তা কঠোর ভাবে পালন করা। জনপ্রিয়তায় সমৃদ্ধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র টিকবে না। সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় ভূমি, সমুদ্র ও আকাশ সীমানা রক্ষা, জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা এবং কৌশলগত সুরক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরক্ষানীতি গ্রহণ করা।

১০। কৃষির আধুনিকায়নঃ

প্রাণবৈচিত্র, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। কৃষিপণ্য উৎপাদনে লাগসই, পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, ফসল উত্তোলন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন। কৃষক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্যে সকল কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও ফসলের যৌক্তিক বাজারদর নিশ্চিত করা। কৃষকের জন্য সহজ ও সুলভে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে কৃষক পর্যায় প্রণোদনা দেয়া।

১১। শিল্প বিকাশঃ

শিল্প ও ব্যবসা উদ্ভাবন, নতুন উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা বিকাশের পথের বাধা সমূহ সরিয়ে দেয়া, সবার জন্য সমান সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। উৎপাদনমুখী ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া। জাতীয় উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পণ্য ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া। আবেদনের এক মাসের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদন ও ইউটিলিটি সার্ভিস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। বিনিয়োগের সুরক্ষা, ব্যবসায়িক চুক্তি বলবৎকরণ ও বিরোধ মীমাংসায় প্রক্রিয় দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ। পেপারলেস ডকুমেন্টস সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ভোগান্তি, সময়ক্ষেপন ও অদক্ষতা দূর করা।

১২। আর্থিক খাত ও উন্নয়ন প্রশাসন:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট বন্ধ, খেলাপি ঋণ উদ্ধার ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সৎ, সাহসী ও যোগ্য নাগরিকদের সমন্বয়ে স্বাধীন জাতীয় কমিশন গঠন করা। বিদেশে পাচার হওয়া টাকা দেশে ফিরিয়ে এনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগে করা। রাষ্ট্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি, দুর্নীতি ও মানহীনতা দূরীকরণে শক্ত মনিটরিং ব্যবস্থা ও কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১৩। শ্রম অধিকারঃ

শ্রমিকের কাজের পরিবেশ, চাকুরির নিরাপত্তা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করা। শ্রমিকের

ওপর দমন-পীড়ন, হামলা ও হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ করা। জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা। শিল্প শ্রমিকদের জন্য আবাসন, পেনশন, জীবন বীমা, স্বাস্থ্যবীমা ও তাদের সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা বীমা চালু করা।

১৪। জনশক্তি রপ্তানিঃ

জনশক্তি রপ্তানিকারক, তাদের নিয়োজিত দালাল এবং জনপ্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্নবাহিনীর দৌরাত্ব, প্রতারণা ও কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করা। সক্ষম ও উৎসাহী তরুণ তরণীকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ভাষাশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। নিরাপদ প্রবাসজীবন, সুস্থ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসমূহের সেবার পরিধি বাড়ানো। প্রবাসী শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিদেশে মারা যাওয়া শ্রমিকের লাশ রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে আনার ব্যবস্থা করা।

১৫। শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করে দেয়া। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে উপযুক্ত সম্মান নিশ্চিত করা। বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশন ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ বিতরণে দীর্সূত্রিতা দূর করা।

ঔপনিবেশিক কাঠামোর উচ্চতর শিক্ষা ও চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নানাবিধ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এই বৈষম্য নিরসন করে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে প্রতিবন্দকতাসমূহ দূর করা। জাতীয় শিক্ষাবোর্ড নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার আয়োজন করবে, যাতে করে যে কেউ চাইলে পরবর্তী ধাপে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে আবেদনের শর্তপূরণ করতে পারে।

১৬। সামাজিক নিরাপত্তাঃ

বেকারত্ব নিরসন ও প্রত্যেক পরিবারে অন্তত একজনের চাকুরি নিশ্চিত করতে জাতীয় কর্মসৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। শিক্ষিত বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে সহজ শর্তে ঋণ ও বেকারভাতা প্রদানের নীতি নির্ধারণ করা। বেসরকারি চাকরিজীবীর জন্য পেনশন ব্যবস্থা এবং সকল নাগরিকের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রচলন করা।

১৭। পরিবহন ও যাতায়াতঃ

পরিবহন আইনের আমূল সংস্কার ও বিআরটিএ-এর পুনর্গঠন করা। সড়ক, নৌ ও রেলপথে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মেয়াদোত্তীর্ণ, ফিটনেস ও লাইসেন্সবিহীন যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা। সম্বনিত রোবট এবং আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় করা। নিরাপদ সড়ক ও জনবাফব গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নদী ও রেলপথকে প্রাধান্য দিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার পুর্নবিন্যাস করা।

১৮। জনস্বাস্থ্য সেবাঃ

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে সবার জন্য সুলভ, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও দুর্ভোগ দূর করা এবং সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন করা। মহামারি মোকাবেলার প্রস্তুতি, প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধি ও অনভিপ্রেত মৃত্যুরোধে সক্ষম একটি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

১৯। দখল ও দূষণ প্রতিরোধ:

প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা ও দূষণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নদী, খাল, বিল, হাওর, জলাশয় সহ বেদখল হওয়া সরকারি সকল ভ,মি দখল মুক্ত করা। সারা দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চালু করা, শহরে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ তৈরি, উদ্যান ও লেকের ব্যবস্থা করা।

২০। খাদ্য ও পুষ্টিঃ

নিম্ন আয় এবং দরিদ্র পরিবারের মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিগুণসম্পন্ন, সুষম ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করতে বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করা। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। দ্রব্যমূল্যের ঊধর্য়গতি নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমিয়ে নিত্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা।

২১। জ্বালানি, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদঃ

প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। জ্বালানি খাতে দুর্নীতি, দায়মুক্তির বিধান ও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে

লুটপাটের আয়োজন বফ করা। খনিজ সম্পদ উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাসে ভারসাম্যপূর্ণ সংমিশ্রণ ও বহুমাত্রিক উৎস থেকে সংগ্রহের নীতি গ্রহণ।